প্রতিদ্বন্দ্বী

স্কুলের রিপোর্টটা ছেলের হাত থেকে ছোঁ মেরে ছিনিয়ে নেয় সুপ্রিয়া, "কি? এবারও ফার্স্ট হতে পারোনি?"

ছোট্ট এক পাতা কাগজ, যেন সম্মোহিতের মত চেয়ে থাকে সুপ্রিয়া। বার বার করে পড়ে। না, কোথাও ভুল নেই। এবারও ফার্স্ট হয়নি বাবুল ওরফে স্বপন মজুমদার। পরীক্ষায় তার স্থান হয়েছে দ্বিতীয়। এমন কি কোন একটি বিষয়েও হাইয়েষ্ট মার্কস পায়নি সে। প্রত্যেক সাবজেক্টে ফার্স্ট বয় মুর্‌লী ও তার মধ্যে বহু মার্কসের ফারাক। শুধু কপাল জোরে দু'চার নম্বরের হেরফের নয়।

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ছেলের দিকে তাকিয়ে সুপ্রিয়া বললো, "আচ্ছা যাও, খেলা করো এখন।"

ম্লানমুখে আস্তে আস্তে মা'র কাছ থেকে সরে এলো বাবলু।

তার আট বছরের কচি মনেও দাগ কেটেছে এই বিফলতা। অথচ চেষ্টার সে ত্রুটি রাখেনি। সুপ্রিয়া সেকথা জানে আর সেই জন্যেই অবাক লাগে তার। দিল্লীতে থাকতে স্কুলের সেরা ছেলে ছিল বাবলু। "টাইনি টট্‌স"এর প্রিন্সিপাল মিস্‌ টম্‌সন্‌ উচ্ছ্বসিত হতেন তার প্রতিভার গুণগানে।

বলতেন, "বিশ্বাস করুন মিসেস মজুমদার, আমার দশ বছরের শিক্ষিকা জীবনে এমন ব্রাইট ছেলে আমি খুব কম দেখেছি ----।"

মাত্র দেড় বছর আগের কথা সে সব।

এলাহাবাদে এসে প্রথমে ওরা বমরৌলীতে বাড়ি পায়নি। শহরে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল তপন। অফিস থেকে মাইল পাঁচেক দূর, পেট্রোলের খরচ জোগাতে প্রাণান্ত। বাবলু বাবার গাড়িতেই স্কুলে যেতো,

ফিরতোও একসঙ্গে। মাস কয়েক পরে তারা ক্যাম্পে ফ্ল্যাট পেলো। স্কুল, অফিস সবই কাছে; ফ্ল্যাটটাও সুন্দর। এলাহাবাদে এসে বাবলুর প্রথম কোয়ার্টার্লি টেস্টের রিপোর্ট দেখে একটু নিরাশ হয়েছিল সুপ্রিয়া, তবে খুব বেশী চিন্তিত হয়নি। জায়গা বদল ইত্যাদির ধকলে পড়াশোনায় একটু ঢিলে পড়েছে, তাই প্রথম স্থানটা "মিস্" করলো এবার, এর পরের পরীক্ষায় নিশ্চয়ই ফার্স্ট হবে। এটাই ভেবে নিয়েছিল।

কৌতুহল বশে জিজ্ঞেস করেছিল অবশ্য, "কে ফার্স্ট হয়েছে রে?"

বাবলু অবজ্ঞার সুরে জবাব দিয়েছিল, "মুর্‌লী। জানো মা, কি বিচ্ছিরি জামা-কাপড় পরে স্কুলে আসে।"

সুপ্রিয়া বাবলুর ছেলেমানুষীতে হেসে উঠে বলেছিল, "ওমা, তোর থেকে নম্বর বেশী পেলেই তার জামা-কাপড় বিচ্ছিরি বলতে হবে? বেশ তো, আর কখনো তাকে ফার্স্ট হতে দিস না।"

তখন কে ভেবেছিল এই দ্বিতীয় স্থানটাই পাকা হ'য়ে যাবে বাবলুর স্কুল জীবনে। অথচ কোন দিকে কোন ত্রুটি রাখেনি সুপ্রিয়া। নিয়ম করে রোজ ঝাড়া দু'ঘন্টা পড়াতো বাবলুকে। তপন মাঝে মাঝে বিরক্ত হ'ত।

বলতো, "দ্যাখো, বড় স্ট্রেন হচ্ছে ছেলেটার। এমন কি একটা কম্‌প্লেক্সে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। ক্লাস থ্রী'এর পরীক্ষায় ফার্স্ট না হয়ে সেকেণ্ড হ'লে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হ'বে। বেচারাকে অত খাটিও না তুমি।"

কিন্তু সুপ্রিয়ার কেমন যেন রোখ চেপে যায়।

নতুন ফ্ল্যাটে আসার ক'দিন পরের ঘটনা।

বাবলু স্কুল থেকে ফিরেই ডাকা-ডাকি সুরু করলো, "মা, ওমা, শীগগীর শুনে যাও।"

সুপ্রিয়া তখন সবে স্নান সেরে চুল মুছছে।

বাবলু ওর হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে থাকে, "মা, মা, মুর্‌লীকে দেখবে তো শীগগীর চলো।"

"মুর্‌লী? তোদের ক্লাসের ফার্স্ট বয়? কোথায় সে?"

"আমাদের বাড়ির পিছনেই থাকে।"

"আমাদের পিছনের ফ্ল্যাটে তো উইঙ্গ কমাণ্ডার আয়েঙ্গার থাকে আর তার পাশেই গ্রুপ ক্যাপটেন জিলানী। কার ছেলে মুরলী?"

আট বছরের বাবলু চোখে মুখে অদ্ভুত একটা ব্যাঙ্গের হাসি এনে বলে, "ধ্যেৎ, তুমি কি ভেবেছো ও অফিসারের ছেলে? ওরা তো চাকর, চাকরের ছেলে ও। ওর বাবা জিলানী আঙ্কলের মালী আর ওর মা ওদের আয়া।"

হাসি চাপতে যেয়ে বিষম খেলো বাবলু।

সুপ্রিয়া গম্ভীর মুখে তাড়া মারে, "ছিঃ, অমন করে বলতে নেই।"

কিন্তু টেবিলে বাবলুকে খাবার দিয়ে বসিয়ে রান্নাঘরের জানলা দিয়ে দেখার লোভ জয় করতে পারলো না সে।

প্রতি ব্লকে চারটে করে ফ্ল্যাট, ওদের ফ্ল্যাটটা দোতলায়। সারভেন্টস্ কোয়ার্টারগুলো সবই নীচে, বাড়ির পিছন দিকে। রান্নাঘরের জানলায় দাঁড়ালে সারভেন্টস্ কোয়ার্টারের পুরো জীবনযাত্রাই চোখে পড়ে। এর আগে সুপ্রিয়া কোনদিন এভাবে দেখেনি। আজ সে জালি দেওয়া জানলা ঘেঁষে উদ্‌গ্রীব চোখে চেয়ে থাকে। ছোট ছোট খুপরী ঘর। দেয়াল ঘেঁষে একটা বারোয়ারী জলের কল। মোটা-সোটা একটি মেয়েলোক স্নান করছে। ভিজে শাড়িতে অতি কষ্টে আব্রু বাঁচিয়ে সাবান ঘষছে বুকে গলায়। নেভি-ব্লু হাফ-প্যান্ট, সাদা শার্ট ও ছেঁড়া জুতো পায়ে একটা রোগা রুক্ষ ছেলে উনুনে কয়লা সাজাচ্ছে। এই তবে মুর্‌লী! সুপ্রিয়া চোখ ফেরাতে পারে না। রোগা লিকলিকে এই ছেলেটার কাছে প্রত্যেক পরীক্ষায়, প্রত্যেকটি বিষয়ে হেরে এসেছে বাবলু, এমন আজগুবি কথা বিশ্বাস হ'তে চায় না তার। এর চেয়ে যদি উইঙ্গ কমাণ্ডার কিংবা গ্রুপ ক্যাপ্টেনের ছেলে মেয়েদের কেউ হ'ত !

নীচু গলায় বলতে পারতো বন্ধুদের, "বুঝতেই পারছো, বড় কর্তার ছেলে ----। আজকাল সর্বত্রই বাটারিংএর ব্যাপার ----।"

পাশের কুঠরি থেকে একটা বাচ্চা মেয়ে টল্‌তে টল্‌তে বেরিয়ে উবু হয়ে মাটিতে বসলো উনুনের হাত দুয়েক দূরে। মেয়েলোকটি স্নান সেরে ঘরে ঢুকছিল, হঠাৎ তার নজর পড়লো সুপ্রিয়ার দিকে। মুহূর্তে ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলো সে।

বাচ্চা মেয়েটার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুললো, "বজ্জাত

হাড়জ্বালানী মেয়ে, যেখানে সেখানে পায়খানা করে রাখবে। এই মুর্‌লী, উনুন পরে ধরাবি, যা ছুড়িটাকে ধুইয়ে আন্ শীগগীর ----।"

সুপ্রিয়া লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি সরে এলো। মুর্‌লীর মা হয়তো ভাবছে মেমসাব্ ওর নামে রিপোর্ট করবে বাড়িঘর নোংরা রাখার জন্যে।

এর পর থেকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে রান্নাঘরের জালি দেওয়া জানলায় দাঁড়ানো একটা নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত হ'ল। ক্রমে ক্রমে অনেক তথ্য জোগাড় করে নীচের ছোট্ট কুঠরির বাসিন্দাদের সম্বন্ধে। রোগা কালো যে লোকটা জিলানীদের বাগানে দুপুর রোদে কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে কেয়ারী বানায় ও আগাছা বুনো ঘাসের "গুড়াই" করে, সেই হ'ল মুর্‌লীর বাবা বনোয়ারীলাল। মালীর কাজ ছাড়া জুতো পালিশ, গাড়ি পরিষ্কার ইত্যাদি আরও দু'চারটে ছুটকো কাজ করে সে। তার বউ বিন্দিয়া জিলানীদের বাড়ির সারাদিনের আয়া। স্বামীর চেয়ে মাইনে বেশী পায়, কদরও বেশী। আজকালকার দিনে মনোমত একটা ঝি পেতে হ'লে কপাল থাকা চাই। এর আগে অন্যান্য জায়গায় ঝি চাকরের কষ্ট অনেক পেয়েছেন জিলানী গিন্নী, কাজেই বিন্দিয়ার কদর বোঝেন তিনি। চল্লিশ টাকা মাইনে, কোয়ার্টার ও সকালের বরাদ্দ চা-রুটি ছাড়াও পুরোনো শায়া, ব্লাউজ ইত্যাদি এটা ওটা প্রায়ই দেন। বিন্দিয়াও প্রাণ দিয়ে খাটে।

তপনের এক ঘন্টা লাঞ্চ ব্রেক। টেবিলে খাবার সাজিয়ে সব কিছু রেডি রাখে সুপ্রিয়া। তাড়াতাড়ি খেয়ে আবার তক্ষুণি রওনা দিতে হয়। কফিটা যে একটু ভাল করে খাবে, তারও উপায় নেই। আজকাল তাই ফ্লাস্কে করে কফি সঙ্গে দিয়ে দেয় সুপ্রিয়া।

বলে, "দরকার নেই বাপু অত হড়বড় করে খাওয়ার ! অফিসে যেয়ে ধীরে সুস্থে খেও।"

বাবলু এর অনেক আগেই খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। স্কুল থেকে এসে কমলা কিংবা মুসুম্বির রস খেয়ে একটু জিরিয়ে স্নান করে বাবলু। তারপর ভাত খেয়ে ঘুম। দুপুরে ঘুমোনোর অভ্যেস নেই সুপ্রিয়ার। খবরের কাগজ কিংবা সেলাই নিয়ে বসে। কোনদিন দু'একখানা চিঠি লেখে। মাঝে মাঝে নিজের অজান্তেই কখন রান্নাঘরের জানলায় গিয়ে দাঁড়ায়। ঘোর দুপুর, রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। মুর্‌লী তার বাবা, মা ও ছোট তিনটি ভাই-বোনের সঙ্গে খেতে বসেছে। রঙ-চটা এনামেলের থালায় ভাত আর ঝোল-ঝোল

একটা তরকারী। কোনদিকে না চেয়ে গোগ্রাসে খেয়ে চলেছে ছ'টি প্রাণী।

দুপুরে ভাত খেতে বসে বাবলু মাছের ঝোলের বাটিটা সরিয়ে দিয়েছিল, "ইস্, নিজেরা মজা করে ইলিশ মাছ খাবে আর আমার বেলায় পমফ্রেট। কিছুতেই খাবো না আমি।"

"লক্ষ্মীসোনা, খেয়ে নাও। রাত্রে কিমা-মটর রাঁধবো তোমার জন্যে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, এরপর আবার আমের অম্বল আছে।"

অম্বলের লোভে মাছের ঝোল ভাত চুপচাপ খেয়ে নিলো বাবলু কিন্তু আবার গোল বাঁধলো দই নিয়ে।

এক চামচ দই মুখে দিয়েই মুখ বিকৃত করলো, "এঃ, শুধুই সরের কুচি।"

এবার আর বিশেষ জোর করতে সাহস করলো না সুপ্রিয়া। কে জানে, গলায় সরের টুকরো আটকে হয়তো বমিই করে বসবে। মন খুঁত খুঁত করে তার, ছেলের আজ ভাল করে খাওয়া হ'ল না। বাবলু হাত মুখ ধুয়ে সাইডবোর্ডের উপরে রাখা ফুটবোল থেকে একটা আপেল নিয়ে কামড় বসালো।

সুপ্রিয়া ফেরাডলের বোতল ও চামচটা খাবার টেবিলের উপর রাখলো, "আস্তে আস্তে খা, অত তাড়া কিসের?"

আশ্চর্য মানুষের মন। একদিন যা আজগুবি বলে মনে হয়, সময়ে তাকেই অসঙ্কোচে মেনে নেয় সে। একটু একটু করে বাবলুদের দৈনন্দিন জীবনে স্থান করে নেয় গরীব ঘরের অপুষ্ট ছেলেটা। সহজ ভাবেই তাকে মেনে নেয় এরা। বিকেলে ক্রিকেট খেলার সময় ছেলে কম হ'লে ডাক আসে মুর্‌লীর। আবার খেলার মাঝখানে তার ছোট ভাই-বোনেরা ডেকে নিয়ে গেলেও কেউ কিছু মনে করে না। ওরা জানে মুর্‌লী এখন বাড়ি গিয়ে ভাই-বোনদের খাওয়াবে কিংবা হয়তো রুটির আটা মাখতে বসবে।

জানলা দিয়ে সুপ্রিয়া ডেকে বলে, "বাবলু, মুর্‌লীকে জিজ্ঞেস করে এসো আজ কি পড়া হয়েছে স্কুলে। তুমি তো যাওনি।"

মুর্‌লীর সোশ্‌ল স্টাডিজের খাতা থেকে প্রশ্নোত্তর লিখে নেয় বাবলু। পরদিন মুর্‌লী খাতা ফেরৎ নিতে এলে সুপ্রিয়া বলে, "খুব সুন্দর

হাতের লেখা তোমার।"

মুর্‌লী লজ্জা পেয়ে মুখ নীচু করে একটু হাসে।

"তোমরা কতদিন আছ এখানে?"

"দু'বছর মেমসাহেব।"

সুপ্রিয়া একটু ইতস্তত করে বলে, "বাবলুর সব বন্ধুরা আমায় আন্টি বলে, তুমিও এবার থেকে তাই বোলো, কেমন?"

মুর্‌লী যাওয়ার জন্যে পা বাড়ায়।

"একটু দাঁড়াও," বলে সুপ্রিয়া এক গ্লাস দুধ এনে ওর হাতে দেয়, "খেয়ে নাও এটা।"

খালি গ্লাসটা রান্নাঘরের সিঙ্কে রাখতে রাখতে শুনতে পায় বাবলু হেসে হেসে বলছে, "এবার থেকে আমরাও আয়াদের আন্টি বলবো, হি হি।"

রাগে চোখ মুখ লাল হয়ে যায় সুপ্রিয়ার। সেদিন মুর্‌লী যাওয়ার পর বাবলুকে বকুনি শুনতে হয় অনেকক্ষণ।

এর কিছুদিন পরের ঘটনা। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে ছাদে বসে কফি খাচ্ছিল সুপ্রিয়া ও তপন। সারভেন্টস্ কোয়ার্টার থেকে ঝগড়ার আওয়াজ ভেসে এলো। এটা এখানকার নিয়মিত ব্যাপার। শুরুতে "সাহেব"দের ভয়ে সাধারণত চাপা গলাতেই ঝগড়া, গালাগাল চালিয়ে যায়, কিন্তু মেজাজের সঙ্গে গলা ক্রমশ উচ্চগ্রামে চড়তে থাকে। আজও তাই হয়েছে। জিলানীদের আয়ার সঙ্গে আয়েঙ্গারের চাকরের বচসা হ'চ্ছে। হঠাৎ বিন্দিয়া সরু গলায় চেঁচিয়ে উঠলো।

তপন বললো, "চলো সু, ঘরে গিয়ে বসি।"

"ঘরে যা ভ্যাপসা গরম ----।"

সুপ্রিয়ার চোখ অন্য দিকে। নীচে ততক্ষণে তুমুল বেধে গেছে। আয়েঙ্গারের চাকর হেঁড়ে গলায় অশ্রাব্য গালাগাল দিচ্ছে, আর এদিকে বিন্দিয়াও সরু গলায় ইনিয়ে-বিনিয়ে সমান তালে উত্তর দিয়ে চলেছে। ছোট বাচ্চাগুলো বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে রণরঙ্গিনী মায়ের দিকে।

দোতলা থেকে জলদ-গম্ভীর আওয়াজ আসে, "বনোয়ারীলাল! বিন্দিয়া!" - গ্রুপ ক্যাপ্টেন জিলানী স্বয়ং। কখন যে সপরিবারে পার্টি থেকে ফিরেছেন, কেউ টের পায়নি। গাড়ির আওয়াজও শোনেনি তারা। কম্পিত বক্ষে বনোয়ারী দাঁড়ায় সাহেবের সামনে। তারপর মুখ কালো করে ফিরে আসে। বিন্দিয়ার মুখও শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। তাদের দু'জনকেই বরখাস্ত করেছেন সাহেব। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কোয়ার্টার খালি করে চলে যেতে হ'বে। স্বামী-স্ত্রী চুপ করে বসে থাকে বারান্দায়; বাচ্চাগুলো এক কোণে বসে বসে ঘুমে ঢুলতে থাকে। খিদেয় পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি হজম হ'য়ে যাওয়ার জোগাড়, কিন্তু বাবা-মাকে সে কথা বলার সময় যে এটা নয়, তাদের ছোট্ট মাথায় সেটুকু বুদ্ধি হয়েছে।

পরদিন সকালে বিন্দিয়া এলো সুপ্রিয়ার কাছে।

"মেমসাব, তোমাদের কোয়ার্টারটা তো খালি আছে, যদি আমাদের দয়া করে থাকতে দাও। এতগুলো বাচ্চা নিয়ে কোথায় যাবো ! যা কাজ বলবে করে দেবো।"

ওদের ঝি রুক্মিণীর বাড়ি পাশের গাঁয়ে। দু'বেলা কাজ করে চলে যায়, কাজেই ঘরটা খালিই পড়ে আছে। বিন্দিয়া অনায়াসে থাকতে পারে সেখানে। কিন্তু তপনের মতটা নেওয়া উচিত। বিন্দিয়াকে অপেক্ষা করতে বলে ফোন করলো তপনকে। ভেবেছিল তপন নিশ্চয় আপত্তি করবে না। বরং খুশিই হ'বে। রুক্মিণী নিজের গোনা-গুনতি কাজ করে চলে যায়। হঠাৎ কোন দরকার পড়লে তাকে পাওয়ার উপায় নেই। এ বরং আর একজন লোক হাতে থাকলো। আর কিছু না হোক তপন বাইরে গেলে অন্তত বাজারটা করে আনতে পারবে। কিন্তু তপন বললো অন্য কথা। জিলানী যখন শান্তিভঙ্গের অপরাধে তাড়িয়েছে, তখন তাদের সেই পাড়াতেই স্থান দেওয়াটা খারাপ দেখায়। তাছাড়া ফ্লাইট লেফ্‌টেন্যান্ট তপন মজুমদারের খোদ উপরওয়ালা জিলানী। এই সামান্য ধৃষ্টতাটুকুই অসামান্য ক্ষতি করতে পারে তার চাকরি জীবনে। বিন্দিয়াকে অবশ্য সে কথা বলা চলে না। বললো, ওরা দেশ থেকে একটা চাকর আনবে শীগগীর। তার জন্য ঘরটা চাই। সুপ্রিয়ার ভারী লজ্জা করতে লাগলো এই মিথ্যা কথাটা বলতে, কিন্তু উপায় কি?

এর কয়েকদিন পরেই ওরা কোলকাতায় চলে গেল। সুপ্রিয়ার ছোট বোন লিলির বিয়ে। তপন দু'মাসের বার্ষিক ছুটিটাও এই সঙ্গে নিয়ে নিল।

সুবিধে হ'লে অন্য কোথাও বেড়িয়ে আসবে এই সুযোগে। সুপ্রিয়ার প্রথমটা একটু মন খুঁত খুঁত করছিল। বাবলুর ফাইনাল পরীক্ষার আর তিনমাসও নেই। এ সময় এতদিন স্কুল কামাই করা কি উচিত?

তপন বললো, "তোমার ছেলে যখন কিছুতেই ফার্স্ট হ'তে পারবে না, তখন একবার না হয় ফোর্থ কিংবা ফিফ্থ্ই হ'ল। তবে গ্যারান্টি দিচ্ছি যে ফেল হবে না।"

সুপ্রিয়া হাসিমুখে বাক্স গোছাতে বসে।

কোলকাতা যাওয়ার আগের দিন লেডীজ ক্লাবে মিসেস জিলানীর সঙ্গে দেখা। ঝি-চাকরের কথা হ'চ্ছিল।

জিলানী গিন্নী মনের দুঃখ ব্যাক্ত করলেন, "আর বোলো না। এর পরের জেনারেশনে বোধহয় কেউ আর ঝি-চাকর এ্যাফোর্ড করতে পারবে না। অন্যান্য স্টেশনে তো আরও খারাপ অবস্থা। যতই তোয়াজ কর, কিছুতেই সন্তুষ্ট নয় তারা। অনেক বছর পর এখানে এসে একটা ভাল আয়া পেয়েছিলাম, এ্যাণ্ড শী হ্যাড টু গো এণ্ড গেট প্রেগন্যান্ট।"

রাগে দুঃখে গলা বুঁজে আসে ভদ্রমহিলার।

সুপ্রিয়া অবাক, "বিন্দিয়ার বাচ্চা হ'বে?"

"আর বলছি কি। আমিও টের পাইনি আগে। প্রায়ই বলতো মাথা ঘোরে, ভাবতাম দুর্বলতার জন্যে। এম.আই. রুমে পাঠিয়েছিলাম। স্কোয়াড্রন লীডার রোহাৎগী দেখে বললো পাঁচ মাসের পোয়াতি। শুনে আমার তো মাথায় হাত ! এখন আবার আয়া জোগাড় করি কোত্থেকে। আয়ার অভাব নেই, কিন্তু বিন্দিয়ার মত ঝি পাওয়া মুস্কিল। এত পরিষ্কার কাজ, আর বাড়তি কাজ করতে বললে এতটুকু মুখ হাঁড়ি করেনি কোনদিন। আমি তাই কর্তাকে বলেছিলাম টেম্পরারী অন্য একটা ঠিকে লোক রাখি, বিন্দিয়া কোয়ার্টারেই থাক। কিন্তু ও বললো বড্ড ঝামেলা। তাছাড়া ডেলিভারীর পর কচি বাচ্চা নিয়ে ওকি আগের মত ভাল করে কাজ করতে পারবে ----।"

তাম্বোলার ডাক শুরু হওয়ায় আলোচনায় ছেদ পড়লো। জিলানী এক কথায় বিন্দিয়া ও তার স্বামীকে বরখাস্ত করায় অবাক হয়েছিল সুপ্রিয়া। আজ ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'ল।

বিয়ে বাড়ি আত্মীয়-স্বজনের ভিড়ে দিনগুলো কোন দিক দিয়ে কেটে গেল বুঝতেই পেল না ওরা। দেওঘর থেকে সুপ্রিয়ার বড়দি এসেছিল।

বললো, "চল্ আমাদের সঙ্গে। তপনের বাকী ছুটিটা তোরা দেওঘরে কাটিয়ে যা। কোলকাতার ভিড়ের পর মন্দ লাগবে না।"

তপন ভেবেছিল সুপ্রিয়া হয়তো আপত্তি তুলবে বাবলুর পড়ার ক্ষতি হ'বে বলে। সুপ্রিয়া কিন্তু এক কথায় রাজী হ'ল। দেওঘরে এর আগেও একবার গেছে সে।

বি.এ. পরীক্ষার পর পাটনায় একটা নার্সারী স্কুলে মাষ্টারী করেছে সুপ্রিয়া। (তপন বলে এখনও নাকি মনে প্রাণে মাস্টারনীই আছে সুপ্রিয়া, শুধু তিরিশ জন ছাত্রের বদলে একা বেচারা বাবলুর উপর দিয়েই সমস্ত ধকলটা যাচ্ছে।) সে বছর ওদের স্কুলের অনেকগুলো বাচ্চার হাম হয়েছিল। একুশ বছরের সুপ্রিয়ারও হাম হ'ল এবং বোধহয় বেশী বয়সে বলেই প্রায় আধমরা করে ছাড়লো তাকে। রোগ সারলো কিন্তু শরীর সারতে চায় না। স্কুলের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দেওঘরে চেঞ্জে গেল সে। ছ'মাস পর তপনের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির করে যখন তাকে বাবা পাটনায় আনালেন, তখন তার স্বাস্থ্য ও লাবণ্যে উজ্জ্বল চেহারা দেখে চোখ ফেরানো যায় না। দেওঘরের সেই ক'টা মাসের স্মৃতি এখনও অম্লান হয়ে আছে সুপ্রিয়ার মনে।

তপন ও বাবলুকে নিয়ে তার সেই প্রিয় শহরে আবার ফিরে আসার আনন্দে কিশোরীর মত উচ্ছল হয়ে উঠলো সে। তপনেরও খুব ভাল লাগলো জায়গাটা। ঘুমন্ত শহর দেওঘর। ক্যাম্পের দমবন্ধ হওয়া সাহেবীয়ানা নেই। প্রতি মুহূর্তে ফিটফাট তটস্থ হয়ে থাকতে হয় না। হাওয়াই চটিতে পা গলিয়ে যখন খুশি বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারে। হিঙের কচুরী ও মিহিদানার চ্যাঙাড়ি হাতে নিয়ে আধমাইল খানেক হেঁটে বাড়ি ফিরতে দেখলেও কেউ কিছু মনে করে না। বাবলুর মজা লাগে বারান্দায় পিঁড়িতে বসে ভাত খেতে।

সেদিন সকাল বেলায় তপন চৌকিতে আরাম করে আধশোয়া হয়ে সিগারেট টানছে। সুপ্রিয়া কাঁসার থালায় লুচি, আলু-কপির চচ্চড়ি আর খানদুই সন্দেশ এনে পাশে রাখলো। বড়দি রান্নাঘরে গরম গরম লুচি

ভাজছে। সুপ্রিয়ার পরনে ডুরে শাড়ি। খাঁটি বাঙালী ধরনে কাঁধে আঁচল দিয়ে পরেছে। তপন তাকে লক্ষ্য করে নীচু গলায় আবৃত্তি করে তার একটি অতি প্রিয় কবিতা।

"এই চুপ ! দিদি শুনছে...." লজ্জায় রাঙা হ'ল সুপ্রিয়ার মুখ।

তপনের মনে পড়লো দশ বছর আগের লজ্জা রাঙানো সুপ্রিয়াকে। শেষের কটা দিন বৈদ্যনাথ মন্দির, ত্রিকুঠি, নন্দন পাহাড়, তপোবন, বাহান্ন বিঘা গোলাপ বাগান ও অন্যান্য দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখে কাটলো। ট্রেনে ওঠার সময় সুপ্রিয়ার চোখে জল এসে গেল। দেওঘরে এসে হারানো দিনগুলো ফিরে পেয়েছিল তারা।

ট্রেন এলাহাবাদে পৌঁছলো রাত্রিবেলা। পরদিন রবিবার। সোমবার থেকে অফিসে জয়েন করলো তপন। বাবলুকে রেডী করে তাকে স্কুলে নিয়ে গেল সুপ্রিয়া। ক্লাস টিচারের কাছে জেনে নিলো কতদূর কি পড়া হয়েছে গত দু'মাসে। মুর্‌লীর কথা জিজ্ঞেস করতে মিসেস আহুজা বললেন মুর্‌লী নাকি আর স্কুলে পড়ে না। মাস দেড়েক হ'ল নাম কাটিয়ে নিয়েছে। হেড মিসট্রেস ওর বাবাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। মুর্‌লী এমনিতেই ফ্রী পড়তো, মিসেস আহুজা ওর বইপত্তর ইত্যাদি আনুষঙ্গিক খরচের ভার নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু ওর বাবা রাজী হ'ল না। বললো মুর্‌লী চাকরি পেয়েছে। কোয়ার্টার ও বিশ টাকা মাইনে। মাথা গোঁজার ঠাঁই পেয়েছে ওরা। মুর্‌লীর মা আসন্নপ্রসবা। এ ক'টা মাস তার পক্ষে চাকরি পাওয়া মুস্কিল। জেনে শুনে এই অবস্থায় কে কাজ দেবে তাকে? তাছাড়া আরও তিনটে শিশু রয়েছে। বনোয়ারীলাল একা কতদিক সামলাবে ----। মিসেস আহুজা একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন। সুপ্রিয়া স্তব্ধ হয়ে শুনলো শুধু।

এরপর মাসখানেক বাবলুকে নিয়ে ব্যস্ত রইলো সুপ্রিয়া। মাঝে এত দিন স্কুল কামাই হয়ে বেশ কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল। কিন্তু মেধা আছে ছেলেটার, অল্প দিনেই আয়ত্ত করে নিলো সব কিছু। পরীক্ষা শেষ হ'ল। এরপর যেদিন বাবলু লাফাতে লাফাতে স্কুলের রিপোর্টটা এনে মা'র হাতে গুঁজে দিলো, সেদিন তার সে কি গর্ব ! তপন তখনও অফিস থেকে ফেরেনি।

সুপ্রিয়া ফোন করলো তাকে, "শুনছো, তোমার ছেলে ফার্স্ট হয়েছে ক্লাসে....।"

তারপর বাবলুর হাতে ফোন দিয়ে বললো, "বাপি তোর সঙ্গে কথা বলবে।"

অফিস থেকে ফিরে তপন ছেলেকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিলো। সুপ্রিয়াকে বললো, "সু, চলো একটু ক্যান্টিন ঘুরে আসি।"

অবাক হয় সুপ্রিয়া, "সে কি, লাঞ্চ খাবে না?"

তপন বলে, "লাঞ্চ ফিরে এসে খাওয়া যাবে। বেশী দেরী হ'বে না।"

ক্যান্টিনে সাইকেল এসেছে, অফিস থেকে ফোন করে খবর নিয়েছে তপন। বাবলুর জন্যে দেড়শো টাকা দিয়ে একটা বাইসাইকেল কিনলো। বাবলুর আকর্ণ বিস্তৃত হাসি দেখে নিজেরই হাসি পেয়ে গেল সুপ্রিয়ার।

দিনটা হৈ চৈ করে কাটলো। পরদিন বিকেল তপন মাঠে ছেলেকে সাইকেল চড়া শেখাচ্ছিল। সুপ্রিয়া গেছে রাস্তার মোড়ে টেলরের দোকান থেকে তার ব্লাউজগুলো আনতে। পাশের দোকান থেকে ছোটখাটো দু'একটা জিনিস কিনে ফিরতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেল। ক্যাম্পের মাঠ খালি হয়ে গেছে। ছেলেমেয়েরা খেলাশেষে যে যার বাড়ি ফিরছে। আয়ারা মনিবদের ছোট বাচ্চাদের বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো সুপ্রিয়া। ঝালর দেওয়া সুন্দর একটা প্র্যাম ঠেলতে ঠেলতে মুর্‌লী আসছে। প্র্যামে আট-ন'মাসের একটা ফুটফুটে স্বাস্থ্যবান বাচ্চা হাত পা ছুড়ে নানারকম আওয়াজ করছে, - বোধহয় কোলে ওঠার ইচ্ছে। মুর্‌লী মুখ নীচু করে সুর করে তার সঙ্গে কথা বলে আশ্বাস দিচ্ছে। মুখ তুলে তাকাতেই সুপ্রিয়ার দিকে নজর পড়লো।

একটা হাত কপালে তুলে কুর্ণিশ করার মত ভঙ্গি করে বললো, "নমস্তে মেমসাব।"

তারপর দ্রুত পায়ে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল।